- বিসমিল্লাহর রাহমানির রাহীম

কুরআন হাদীসের আলোকে সন্তান সন্ততিকে লালন পালন করার ফজিলত গুরুত্বঃ

ভূমিকাঃ- মহান আল্লাহ তালা পৃথিবীতে মানুষকে যতগুলো নেয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে সন্তানসন্ততি আল্লাহ্-তালার এক শ্রেষ্ঠ দান।কোর আনে সন্তানসন্ততিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সূরা কাহাফের ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।"সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য "

অন্য আয়াতে সন্তান লাভের বিষয়টিকে দান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহতালা বলেন, তিনি যাকে খুশি সন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি পুত্রসন্তান দান করেন এবং যাকে খুশি কন্যা ও পুত্র উভয়টিই দান করেন । যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল, (সূরা আশ শুরা ৪৯)

সন্তান প্রতিপালনে যত্নশীল হতে হবে কেনঃ

সন্তান শুধু মহান আল্লাহর পবিত্র দান বা উপহার নয় বরং আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। পরকালে আল্লাহ তালা পিতামাতাকে সন্তানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.বলেন, সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। কেননা তুমি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর সন্তান জিজ্ঞাসিত হবে সে তোমার প্রতি কতটা অনুগত ও সহযোগী ছিল। (বায়হাকী, হাদিস ৪৬৯১)

নবীগণের ফিকিরঃ

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون
من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابايك إبرهم وإسمعيل وإسحق إلها واحدا
ونحن له مسلمون“তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন (হযরত)ইয়াকুব(আলাইহিস সালাম)-এর মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছিল এবং যখন তিনি নিজের পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা আমার (ইন্তিকালের) পর কার ইবাদত করবে? তখন তারা সকলেই জবাব দিয়েছিল, আমরা ওই মহান সত্তার ইবাদত করব, যাঁর ইবাদত আপনি করতেন এবং আপনারপূর্বে আপনার মুরুব্বীবর্গ- হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ও ইসহাক (আলাইহিস সালাম) করতেন,অর্থাৎ ওই মা'বুদেরই ইবাদত করব, যিনি এক, যাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমরা তাঁরই আনুগত্যের ওপর সুদৃঢ় থাকব।”(সুরা বাকারা,১৩৩)

উল্লিখিত আয়াতের পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে,হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামও মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় সন্তানকে এই একই অসীয়ত করেছিলেন। এ আয়াতদ্বয় থেকে সাধারণ মানুষ এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়ার

মাল-দৌলতের চিন্তা ও গুরুত্বই সর্বাধিক থাকে। তাই মৃত্যুর পূর্বে তারা কামনা করে যে, বড় বড় সম্পদ যা-কিছু তার নিকট আছে, তা সন্তানদেরকে দিয়ে যাবে। সে আরও চায় যে, তারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করুক। একজন কোটিপতি বা শিল্পপতির আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, আমার সন্তানরা মিল-ফ্যাক্টরিসমূহের মালিক হবে, তাদের কাছে এক্সপোর্ট ও ইমপোর্টের বড় বড় লাইসেন্স
থাকবে। লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স থাকবে।তদ্রূপ একজন উচ্চপদস্থ পিতার বাসনা থাকে যে, তার ছেলেও উচ্চপদ অর্জন করবে এবং বড় অংকের বেতনের চাকুরী পাবে ইত্যাদি।পক্ষান্তরে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের নজরে সর্বাধিক গুরুত্ব পেত প্রকৃত দৌলত তথা ঈমান ও আমলে সালিহ।এ কারণে মৃত্যুর পূর্বে তাঁদের এবং তাঁদের অনুসারীদের একান্ত কামনা হতো, যে জিনিসকে তারা প্রকৃত, স্থায়ী ও সর্বাধিক দামি সম্পদ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, সেই সম্পদ তাদের সন্তানদের অর্জন হয়ে যাক। এরজন্য তারা আজীবন তো চেষ্টা-মেহনত করতেনই, জীবনেরশেষ মুহূর্তেও অত্যন্ত তাগিদের সাথে ওই দৌলতের অসীয়ত করে যেতেন। যেমন উল্লেখিত দুই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

সন্তানদের ব্যাপারে পিতা-মাতার প্রকৃত চিন্তাঃ

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম-এর উল্লেখিত রীতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার ওপর সন্তানের ফরয হক হলো সর্বপ্রথম তাদের জন্য প্রকৃত ও স্থায়ী দৌলত এবং আসল কল্যাণ ও কামিয়াবির ফিকির ও ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ সন্তানকে কুরআনে কারীম ও দ্বীনের জরুরী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া, যে মালিক সব ধরনের নেয়ামত দিয়েছেন, তাঁর যথার্থ বন্দেগী ও গোলামী পালনের জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। যাতে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর অফুরন্তনেয়ামতের ভাণ্ডার জারি থাকে এবং যাতে তাঁর গোলামী ও বন্দেগীর ইলম না থাকায় তাঁর নাফরমানির দরুন নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে
কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে না হয় ।

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফীলত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি কুরআনেরও কয়েকটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হলো।

১. কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

“যারা (আল্লাহ ও রাসুলকে) বিশ্বাস করবে এবং যাদেরকে দ্বীনী ইলম দেওয়া হবে (অর্থাৎ যারা কষ্ট মুজাহাদা করে ইলমে দ্বীন হাসিল করবে), আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।(সরা মুজাদালাহ,১১)

২. আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

“বলো তো, যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করেছে এবং যারা তা অর্জন করেনি, তারা উভয় কি সমান হতে পারে?'(সুরা যুমার,৯)

অর্থাৎ যারা ইলম অর্জন করেনি, এমনকি যাদের উলামায়ে কিরামের সাথে ওঠাবসা বা কোনোরূপ যোগাযোগও নেই, তাদের জন্য আল্লাহর যথার্থ গোলামী অসম্ভব। আর গোলাম হয়ে মালিকের গোলামীর খবর না রাখায় তারা পশুস্তরেরও নীচে চলে যায়। সুতরাং
তারা কখনো ইলমওয়ালাদের সমান হতে পারে না।

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-طلب العلم فريضة على كل مسلم.

"দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান (নর-নারী)-এর ওপর
ফরযে আইন। (ইবনে মাজাহ ১/১৩৬)

অর্থাৎ এ ব্যাপারে অবহেলা করলে আল্লাহর দরবারে কোনো প্রকার

ওজর-আপত্তি গ্রহীত হবে না।

৪. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

“তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআনে কারীম শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।”(সহীহ বুখারী ২/১২৯৪)

৫. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-“আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে দ্বীনের ইলম দানকরেন।”(বুখারী ১/৩৯)

৬. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- لا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وماوالاه، وعالم أو متعلم

“দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়ার মধ্যে যা-কিছু আছে সবই অভিশপ্ত তবে শুধু আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী এবং তার সহায়ক বস্তু এবং দ্বীনের আলেম কিংবা তালিবে ইলম, এরা অভিশপ্ত নয়।”(তিরমিজি শরীফ,২৩২২)

৭. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إن العلماء ورثة الأنبياء، و إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما،
إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

“আলেমগণ নবীগণের উত্তারাধিকারী। নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে মীরাস সূত্রে টাকাপয়সা, সোনা-রুপা রেখে যাননি, রেখে গেছেন শুধু দ্বীনী ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করেছে, সে অনেক বড় দৌলত অর্জন করেছে!"(তিরমিজি, ২৬৮২)

এখানে মাত্র নমুনাস্বরূপ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর মূর্খের জন্য দলীল-প্রমাণের পাহাড়ও বৃথা। সুতরাং এখানে অনেক বেশি হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। অন্যথায় এ ব্যাপারে এতবেশি ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যা একত্রিত করলে মোটা ভলিউমের বৃহৎ কিতাব তৈরি হবে।

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করার ফায়দা ও উপকারিতা

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার কয়েকটি ফায়দা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ইলমে দ্বীন শিক্ষার মাধ্যমে খালিক মালিক আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ হয়, মানুষ যে আল্লাহর দাস ও গোলাম, তা সম্যকরূপে জানা যায় এবং গোলাম হিসেবে তার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পড়ে, তা শেখা যায়। আর এরই মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ-এর ইলম ব্যতীত দুনিয়াতে যত প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সবগুলো দ্বারা শুধু পশুচাহিদা তথা খানাপিনা ও দৈহিক আরামআয়েশের ব্যবস্থা অর্জিত হয়। এর বাইরে মানুষ যে সৃষ্টির সেরা, বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জগৎ আসছে, সেখানে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, তারপর হয় চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হবে কিংবা চিরস্থায়ী ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে—এ সব বিষয়ের কোনো আলোচনা বা দিকনির্দেশনা সেই সকল শিক্ষার মধ্যে নেই।পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীস ও দ্বীনের ইলম এ শিক্ষা দেয় যে, মানুষের দুনিয়াতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমান ও আমলকে দুরস্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। খানাপিনা ও মানুষের আরামআয়েশ মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বেঁচে থাকার জন্য এগুলোর দরকার আছে বটে কিন্তু তাই বলে এগুলোই যে জীবনের সবকিছু,এমনটি নয়।

২. দ্বীনী ইলম (চাই সে ইলম মাদরাসায় পড়ে শিক্ষা লাভ করুক বা উলামায়ে কিরামের সাথে ওঠাবসার দ্বারা অর্জন করুক। তা)দ্বারা প্রকৃত সম্মান ও শান্তি অর্জিত হয়। সূরা মুনাফিকুনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, “প্রকৃত ইজ্জত-সম্মান মুমিনদের জন্য নির্ধারিত।” সুতরাং ঈমান-আমল ছাড়া বাহ্যিক ও অস্থায়ী ইজ্জত মিললেও স্থায়ী ইজ্জত ও মানুষের অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অর্জন হয় না।

তেমনিভাবে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "একমাত্র কুরআন অনুযায়ী চলার দ্বারা দিলের প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ হয়।" বোঝা গেল,
কুরআনের ইলম দ্বারা ঈমান ও আমল দুরস্ত করার মধ্যেই একমাত্র সুখশান্তি নিহিত।
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه طيبة
"যে সকল নর-নারী ঈমান ও আমল দুরস্ত করবে, তাদেরকে হায়াতে তাইয়্যিবা বা মজাদার যিন্দেগী দান করা হবে।(সুরা নাহল,৯৭)
সুতরাং দ্বীনী ইলম ও আমল বাদ দিয়ে বাহ্যিকভাবে সুখসামগ্রী জমা করা গেলেও প্রকৃত সুখশান্তি ও দিলের আনন্দ তা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-
'যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন তিক্ত ও কষ্টদায়ক করে দেওয়া হবে।
(সূরা ত্বহা,১২৪) অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন–
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنيا
"পাপীদের ধন-জন যেন তোমাদের মোহিত না করে। কেননা
আল্লাহ তাআলা চান যে, ওগুলো দ্বারা তাদেরকে দুনিয়াতে আযাবে নিপতিত করুন।
"(সূরা তওবা,৫৫)
৩. দ্বীনী ইলম ও আমল এমন সম্পদ, যা সবসময় সঙ্গী হয়ে থাকে।ফলে দ্বীনী ইলম সম্পন্ন ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়া থেকে বেনিয়ায(অমুখাপেক্ষী) হয়ে যায়। তার অন্তরে এমন খুশি-তৃপ্তি নসীব যা রাজা-বাদশাদেরও নসীব হয় না। অপরদিকে পার্থিব শিক্ষা ও মালদৌলত নেহাত অস্থায়ী। পরকালে এগুলোর কোনোই মূল্য নেই।
এমনকি দুনিয়াতেও ওগুলো যে কোনো সময় ধ্বংস হয়ে যেতে
পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিতদের চাকুরীর বয়স
শেষ হওয়ার পর তাদের শিক্ষা-ডিগ্রী তেমন কোনো কাজে আসে না।
৪. কেউ দ্বীনী ইলম অর্জনরত অবস্থায় মারা গেলেও সফল। আল্লাহর
দরবারে সে শহীদ হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহ তাআলা তার ওপর
সন্তুষ্ট হয়ে যান। পক্ষান্তরে পার্থিব বিদ্যা অধ্যয়নরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার সবই বিফলে যায়। এ অসম্পূর্ণ বিদ্যার মাধ্যমে
দুনিয়া বা আখিরাতে কোনো কল্যাণ তার সাধিত হয় না।
৫. দ্বীনী ইলমের বদৌলতে একজন নিম্ন খান্দানের সাধারণ মানুষও আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার মহাগৌরব অর্জন করতে পারে এবং নবীওয়ালা মহান দ্বীনী কাজ আঞ্জাম দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল শ্রেণির মুসলমানদের সরদার হতে পারে। আর পরকালে ভয়াবহ আযাব থেকে বেঁচে মহাকল্যাণ লাভে ভূষিত হয়।ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ইন্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "কবরে আসার পর আমাকে বলা হলো, তুমি কী চাও? আমি বললাম, হে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো, হে মুহাম্মাদ! তোমাকে যদি আযাব দেওয়ার ইচ্ছা আমার থাকত,তাহলে তোমাকে দ্বীনী ইলম কেন দান করা হয়েছিল? তোমাকে আমার (তথা দ্বীনী) ইলম এজন্যই দান করা হয়েছিল যে, আমি তোমাকে মাফ করতে চাই।"পক্ষান্তরে দ্বীনবিহীন শুধু পার্থিব বিদ্যা ফিরআউন, কারূন ও হামানের ন্যায় দুনিয়াদারদের উত্তরাধিকার। এ বিদ্যা

ব্যক্তিকে না দুনিয়াতে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি তথা মুসলমানদের সরদার বানাতে পারে।(অবশ্য তাদের ভৃত্য-অনুচর বানাতে পারে!) আর না আখিরাতের আযাব হতে বাঁচাতে পারে।

৬. দ্বীনী ইলম দ্বারা পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম হয় এবং ইসলাম টিকে থাকে। জানা কথা, কোনো কিছু সে বিষয়ের পারদর্শী লোক ছাড়া চলতে পারে না। সুতরাং যারা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে বিদ্যমান দেখতে চায়, তাদের কর্তব্য দ্বীনী মাদরাসা
কায়েম করা এবং নিজের সন্তানদের সেখানে তালীম দেওয়ার ব্যবস্থাকরা। কেননা শুধু জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারা কিছুতেই
ইসলাম কায়েম হতে বা টিকে থাকতে পারে না। যদি তারা আলেমদের দিকনির্দেশনা ছাড়া বাহ্যত ইসলামের নামে কোনো কিছু দাঁড় করেও ফেলে, তবে তা কোনো ক্রমেই সহীহ ইসলাম হবে না।বরং তা হবে ইসলামের নামে অন্য কিছু, যার দৃষ্টান্ত হলো বিভিন্ন গোমরাহ ও ভণ্ড ব্যক্তিদের প্রবর্তিত 'নকল ইসলাম'। তারা নিজেদের
বুঝ মতো ইসলামের এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছে, যার সাথে প্রকৃত ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। এক কথায়, সেটাকে 'মডার্ন ইসলাম' ও ভেজালযুক্ত ইসলাম বলা যেতে পারে, 'মদীনার ইসলাম' তা কিছুতেই নয়। ওই ইসলামে বিশ্বাসীদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে'র অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা জায়েয হবেনা কখনো।

৭. দ্বীনী ইলমের ধারক-বাহকগণ পৃথিবীর অস্তিত্বেরও নিশ্চিতকারক।
হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে যতদিন দ্বীনী ইলমের একজন চর্চাকারীও
অস্তিত্ব টিকে থাকবে।
দুনিয়ায় থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত আসবে না অর্থাৎ দুনিয়ার
হিন্দু প্রভৃতি এবং অন্যান্য দুনিয়াদার দুনিয়াতে উন্নতি করার এবং
বোঝা গেল, পৃথিবীর অপরাপর সকল জাতি তথা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান,
দুনিয়াকে ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে কেবল দ্বীনী ইলমের ধারক-
বাহকগণের বদৌলতে। যেদিন পৃথিবীতে দ্বীনের চর্চাকারী একজন
আলিমও অবশিষ্ট থাকবেন না, সেদিন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে
তছনছ করে দেবেন; কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।
দুনিয়ার নিয়ম হলো, কোনো শহরের অধিকাংশ লোক বিদ্রোহী হলে
পুরো শহরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা
রাহমান, অসীম দয়ালু। তাই অধিকাংশ মানুষও তার বিদ্রোহী হলে
তিনি দুনিয়াকে ধ্বংস করবেন না। বরং যখন একসাথে সকল মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যাবে; একজনও ফরমাবরদার থাকবে না, কেবল
তখনই তিনি দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তখন দুনিয়ার সকল লোক পার্থিয় শিক্ষার যত উচ্চতর ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তাদের সামান্যতমও মূল্যায়ন করে এক সেকেন্ডের জন্য দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না।

৮. মুসলমানদের পার্থিব কল্যাণও দ্বীনী ইলম চর্চার মধ্যে নিহিত।মুসলমানদের জন্য কিছুতেই ঠিক হবে না বেদ্বীন কাফির সম্প্রদায়ের অবস্থার সাথে নিজেদের অবস্থা তুলনা করা। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি কাফির সম্প্রদায় গলদ পন্থায় মালদৌলত উপার্জন করেতথাকথিত উন্নতি অর্জন করতে পারে, কিন্তু দুনিয়ার শুরু থেকে আজ

পর্যন্ত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের দুনিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতিও দ্বীনের মধ্যে নিহিত। যখন তাদের দ্বীনী উন্নতি হয়েছে,
তখন তাদের পার্থিব অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে। এমনকি রাজত্ব-কর্তৃত্বও তাদের পদচুম্বন করেছে। আর যখন দ্বীনী অবস্থার অবনতি ঘটেছে, তখন তাদের পার্থিব উন্নতি-প্রগতিও বিপর্যস্ত হয়েছে।এমনকি দ্বীনী অধঃপতনের ফলে তাদের শত শত বছরের রাজত্ব-কর্তৃত্ব কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং চরমভাবে তাদের হাতে
লাঞ্ছিত হয়েছে। ব্যাপকভাবে মার খেয়েছে।
বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বরং তা পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। মুসলিম মিল্লাত যখনই কুরআনী শিক্ষাকে 'মোল্লাগিরী' ও 'ফকীরী বিদ্য' নাম দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং খ্রিষ্টান ও বিধর্মীদের বিদ্যার প্রতি ঝুঁকেছে, তখনই তাদের মানমর্যাদা ও ইজ্জত-সম্মান সব ভূলুণ্ঠিত হয়ে কাফিরদের তোষামোদ, গোলামী ও অন্ধ অনুকরণের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছে। যতদিন তারা এ ভুলের সংশোধন না করবে এবং দ্বীনী ইলমের মাধ্যমে ঈমান-আমল দুরস্ত না করবে, ততদিন তারা কাফিরদের গোলামীর জিঞ্জিরেই আবদ্ধ থাকবে; দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে এ দুরাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাদের মুক্তির একমাত্র পথ দ্বীনী ইলম ও আমলের মেহনতের দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা।
৯. দ্বীনী ইলম দ্বারা আপামর মানুষের পার্থিব কল্যাণ লাভের পাশাপাশি পরকালীন প্রভূত কল্যাণও অর্জিত হয়। কারণ একজন আলেম তার ইলম দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে দুনিয়াতে তারা কিভাবে সৎপথে চলবে, কিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, কিভাবে অন্যায়-অনাচার ও জুলুম-অবিচার থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, কিভাবে অন্যের সার্বিক কল্যাণকামনায় নিয়োজিত হবে। সেই সাথেএকজন আলেম পথভোলা মানুষকে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর চির সন্তুষ্টি তথা জান্নাতের রাস্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।
পক্ষান্তরে জাগতিক শিক্ষা থেকে নিজের পেট-পূজা ও ভোগবিলাস ছাড়া অন্যকে সৎ ও নীতিবান বানানোর কোনো দিকনির্দেশনা সাধারণত লাভ হয় না। তারা তাদের ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারি প্রভৃতি লাইন দ্বারা সামান্য সুনামসুখ্যাতি এবং পার্থিব কিছু কল্যাণ অর্জন ছাড়া পরকালীন কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারে না বা তাদের অধিকাংশই সেদিকে তৎপর হয় না। জানা কথা, মানুষকে তার শারীরিক রোগ থেকে মুক্তিদেওয়া আর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে রয়েছে
আকাশ পাতাল তফাৎ। অবশ্য নিয়ত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার পার্থক্য তো আছেই।
১০. দ্বীনী ইলম দ্বারা ঈমান ও আমলের পরিবেশ গড়ে ওঠে। নামায,

রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল রিযিক, ন্যায়নীতি, পিতা-মাতাসহ
অহংকার, কার্পণ্য ইত্যাদি মন্দ চরিত্র দূর করার শিক্ষা লাভ হয়।
সকল মানুষের অধিকার আদায় এবং অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ,
শান্তির পরিবেশ গড়ে ওঠে। ফলে সমাজে ও দেশে পরস্পর
দুনিয়াতে জান্নাতি পরিবেশ কায়েম হয়। সুখ-শান্তি এবং জানমাল ও
ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
কেননা নামায দ্বারা আল্লাহর সামনে বার বার নিজের ক্ষুদ্রতা
প্রকাশের মাধ্যমে মানুষ বিনয়ী হয়, তার থেকে অহংকার দূর হয়।
আর এটাই ঐক্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের ভিত্তি ও বুনিয়াদ। তেমনিভাবে
রোযা দ্বারা পশুস্বভাব, উগ্রতা ও হিংস্রতার সংযম হয় এবং অন্যের
দুঃখবেদনা অনুধাবনকরত তাদের সমবেদনা ও সহযোগিতার মনোভাব
সৃষ্টি হয়। অনুরূপ যাকাত দ্বারা কার্পণ্য দূর হয়ে অন্যের প্রতি
কল্যাণকামনার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হয়। আর হজ্জে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের
ঈমানী ইজতিমা দ্বারা বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং একে অন্যের
জরুরত ও সমস্যা অবগত হয়ে তার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ
করার সুযোগ পায়। আর হালাল রিযিকের নীতিআদর্শ মেনে চলার দ্বারা
ব্যবসাবাণিজ্যে ধোঁকা-ফাঁকি, নকলভেজালসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল
প্রকার অন্যায় অনিয়ম তিরোহিত হয়।
আর ইসলামের অধিকার আদায়ের নীতি অনুসরণ দ্বারা কোনো
মুসলমানের তো দূরের কথা, কোনো কাফির-বেদ্বীনেরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার
পথ থাকে না।
ও পরকালের জান্নাত লাভের পাশাপাশি দুনিয়ারও প্রভূত কল্যাণের সমূহ
সুতরাং ইসলামের প্রত্যেক ইবাদত ও বিধানের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি
উপকরণ বিদ্যমান। এর দ্বারা জুলুম-শোষণ, ফিতনা-বিশৃঙ্খলা বন্ধ হয়ে
ন্যায় ও শৃঙ্খলাভিত্তিক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।জাগতিক বিদ্যার মধ্যে এ সবের নাম মাত্রও নেই। তারা সুনাম বা
পদের লোভে জনসাধারণের সাময়িক কিছু কল্যাণ করলেও যেখানে
তাদের স্বার্থ নেই বা বদনামী ও শাস্তির আশঙ্কা নেই, সেখানে তারা
অন্যের কল্যাণে কিছুই করে না।
দ্বীনী ইলম ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে উল্লেখিত পর্বত মহাপর্বতসম
ব্যবধান জানার পর কোনো পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানকে দ্বীনী ইলমের মহা
কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে পার্থিব নগণ্য স্বার্থের মোহে সন্তানের অমূল্য
জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার খেয়ানত তারা করতে পারেন না।
কারণ সন্তান মাতা-পিতার কাছে আল্লাহর আমানত। প্রত্যেক মুসলিম
অভিভাবককে এর জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে।
সন্তান পিতা-মাতার জান্নাত বা জাহান্নামের কারণঃ
সন্তানকে কুরআন ও দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার জন্য
সবচেয়ে বড় কামিয়াবী। এমন পিতা-মাতা অন্য পিতা-মাতার তুলনায়

প্রকৃতপক্ষেই বড় ভাগ্যবান। তারাই সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যশালী ।
দুনিয়ায় আসার পর প্রত্যেকের সামনে তিনটি জগৎ থাকে। কারণ পার্থিব জগৎ, কবর জগৎ ও আখিরাত জগৎ। যে পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে কুরআনে কারীম ও দ্বীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে শুধু পার্থিব রুটিরুজির জন্য জাগতিক শিক্ষা দেয়, তারা সন্তান দ্বারা কেবল দুনিয়াতেই যৎকিঞ্চিৎ উপকৃত হতে পারে। তাও নিশ্চিত নয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত কথা পরে আসছে। কিন্তু তার দ্বারা কবরজীবন এবং আখিরাতজীবনে কোনো উপকার পাওয়ার আশা করতে পারে না। উল্টো সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ফরয দায়িত্ব আদায় না করার দরুন এবং ইলমে দ্বীন না থাকার ফলে সন্তান যে সকল অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি করবে, তাতে পিতা-মাতও গুনাহে অংশীদার হওয়ার দরুন প্রত্যেক ঘাঁটিতে তারা আটকা পড়বে এবং আযাব ও গযবের সম্মুখীন হবে।
পক্ষান্তরে যারা সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, তারা দুনিয়াতে, কবরে ও আখিরাতে কামিয়াব হবে। সকল স্থানে সন্তানের অসিলায় সুখশান্তি ও আরাম ভোগ করবে।সন্তানকে দ্বীন শিক্ষাদানে কবর জগতের শান্তি ও উপকারিতাঃ
দুনিয়ার জীবন কোনো না কোনোভাবে পার হয়েই যাবে। কারও বালাখানায়, কারও কুঁড়েঘরে, কারও আরামে, কারও দুঃখকষ্টে, সর্বাবস্থায়ই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ মোতাবেক এ উম্মতের অধিকাংশের হায়াত ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে শেষ হয়েই যাবে। (ইবনে মাজাহ ২২১০)
কেউ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না। তা সে যত বড় রাজা-বাদশাহ আর সম্পদশালী ও সম্মানের অধিকারীই হোক না কেন, সকলকেই জীবনসায়াহ্নে পৌঁছতে হবে। সকলেরই শেষ পরিণতি এই হবে যে, সারা জীবনের অর্জিত গাড়ি-বাড়ি, রাজত্ব-কর্তৃত্ব, বাগবাগান, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবকিছু রেখে, সবকিছু ছেড়ে সম্পূর্ণ খালি হাতে পরকালের প্রথম ঘাঁটি কবরে পৌঁছে যাবে। মালদৌলত, ইজ্জত-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র কেউ সঙ্গী হবে না। দাফনের পর সকলেই বাড়ি ফিরে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যে অন্ধকার কবরে অত্যন্ত ভয়ংকর আকৃতিতে মুনকার-নাকীরের আগমন ঘটবে।
এখানে তাকে ঈমানের পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। সেই পরীক্ষায় দুনিয়ার কাউকে পাবে না সহযোগিতার জন্য। দুশ্চিন্তা ও হতাশার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে। তার অবস্থা স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন
ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه من أب
أو أم أو صديق، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها
وإن الله عز و جل ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال
الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم.
• ব্যক্তির অবস্থা কবরে এরূপ হয়, যেরূপ সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তি সাহায্যের আশায় চিৎকার করতে থাকে এবং চতুর্দিকে হাত-পা

অর্থাৎ মৃত

নাড়তে থাকে; যাতে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা করতে পারে।

তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তি তার মা-বাবা, বন্ধুবান্ধবের দুআর অপেক্ষা করতে থাকে, মন থেকে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। অতঃপর যখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো দুআ, ইস্তিগফার (বা দান-খয়রাত) তার নিকট পৌঁছে, তখন তা তার কাছে সমগ্র দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা-কিছু আছে, সবকিছু থেকে প্রিয় হয়।

আর দুনিয়াবাসীর দুআকে আল্লাহ তাআলা পাহাড়সম বৃদ্ধি করে মৃত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেন। মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের হাদিয়া হলো- তাদের জন্য ইস্তিগফার অর্থাৎ তাদের গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা।"(মিশকাত শরীফ,১/৪৪০)

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় সন্তানকে কুরআন ও দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেন, তাহলে নিশ্চিত তিনি সাগরে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় কবরে সাহায্যকারী পাবেন। সেখানে কখনো একাকিত্ববোধ করবেন না। বরং সন্তানদের পক্ষ থেকে সর্বক্ষণ তার নিকট হাদিয়া- দুআইস্তিগফার পৌঁছতে থাকবে। সন্তান যখন আল্লাহর দরবারে হাত তুলে তার শেখানো দুআ দ্বারা দুআ করতে থাকবে, তখন মৃত পিতা-মাতা খুশিতে বাগবাগ হয়ে যাবেন। এমনকি যে মুহূর্তে সন্তান দ্বীনের অন্যান্য কাজে লিপ্ত থাকবে, লোকদের কুরআনে কারীম শিক্ষা দেবে, ওয়ায-নসীহত এব দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করছে থাকবে এবং এসব ব্যস্ততার কারণে বাহ্যত পিতা-মাতার জন্য দুআকরার অবসর পাবে না, তখনও তার সকল নেক কাজের সাওয়াব পিতা-মাতা পেতে থাকবেন। কেননা তাদের সহযোগিতা ও শিক্ষাদানের ফলেই সে আজ বিভিন্ন নেক কাজ করতে পারছে। ফলে তারা তার প্রত্যেক নেক কাজে অংশীদার থাকবে, আর এভাবে তাদের নেকী বাড়তেই থাকবে।

এমনকি যদি মৃত্যুর সময় তাদের কারোর গুনাহ বেশি এবং নেকী কম থাকে, তবু সন্তানদের অহরহ দ্বীনী খিদমতের নেকী তাদের আমলনামায় যোগ হওয়ার কারণে ইনশাআল্লাহ তাদের নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লার ওপর ভারী হয়ে যাবে, ফলে তারা আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবেন। এর চেয়ে বড় খুশির বিষয় আর কী হতে পারে!

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

"মানুষের মৃত্যুতে তার আমলের অবসান ঘটে। কেবল তিনটি আমল ব্যতীত। সেগুলো হলো- ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. ওই ইলম, যা দ্বারা (জগৎ) উপকৃত হয়। ৩. এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করতে থাকে।"(মুসলিম শরীফ,১৬৩১)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إن الله عز و جل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول : يا رب أنى لي هذه؟ فيقول : باستغفار ولدك لك.

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নেক বান্দার মৃত্যুর পর জান্নাতে তার দরজা বুলন্দ করে দেবেন অর্থাৎ তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করবেন। ফলে সে বলবে, হে প্রভু! আমার কী করে এত বড় দরজা ও সম্মান নসীব হলো? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দুআ ও ইস্তিগফারের অসিলায় এত বড় মর্তবা তোমাকে দেওয়া হয়েছে।”(মুসনাদে আহমাদ,১০৬১০)আল্লাহতালা বলেন"জেনে রেখ, কিয়ামতের প্রকম্পন এক সাংঘাতিক জিনিস যেদিন তোমরা তা দেখতে পারে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী সেই শিশুকে (পর্যন্ত) গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে, যেন তারা তুলে যাবে, যাকে সে দুধ পান করিয়েছে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী তার নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (সেদিন) আল্লাহর শাস্তি হবে। অতি কঠোর ।(সুরা হজ্জ,১,২)

এই কঠিনতম দিনে পিতা-মাতা নিজ সন্তানের সুফল ভোগ করবে, যদি তারা সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকেন ।

এ ব্যাপারে হযরত মু'আয জুহানী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من قرأ القران و عمل بمافيه، ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءة أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم! فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟.

“যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তদুনুযায়ী আমল করল (কুরআনী যিন্দেগী অবলম্বন করল), কেয়ামত দিবসে তার পিতা-মাতাকে একটি করে) নূরের মুকুট পরানো হবে। সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে থাকলে যে আলো হতো, তার চেয়েও অধিক সুন্দর হবে সেই মুকুটের জ্যোতি। তাহলে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা, যে কুরআনের ওপর স্বয়ং আমল করবে? (আবু দাউদ ২/৯৭, ১৪৫৩) আগে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিন; তারপর দুনিয়াবী শিক্ষা: সন্তানকে ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার পর যদি দুনিয়া উপার্জনের জন্য পার্থিব বিদ্যা শিক্ষা দেয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়। বরং সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে ফরযে আইন ইলম থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখে সন্তানকে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পরিণতিতে পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক সন্তান বেদ্বীন-নাস্তিকও হয়ে যাচ্ছে! উপরন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এ সন্তানগুলোর অজ্ঞতা মুসলিম মিল্লাতের বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!! আল্লাহ ও রাসূল যেসব বস্তুকে মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সহীহ ইলম না থাকায় সেগুলোকেই তারা প্রগতির নেশায় ও আশায় একের পর এক

গ্রহণ করে চলছে! ফলে নেমে আসছে ধ্বংস-বিপর্যয়।
ইংরেজ তথা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের অনুকরণকে হাদীস শরীফে ধ্বংসের এক নম্বর কারণ বলা হয়েছে। অথচ দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম না থাকায় জেনারেল শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই পরোক্ষভাবে ইংরেজ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ইংরেজদের চিন্তাচেতনা, নিয়মনীতি, বেশভূষাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করছে এবং তাদের তোষামোদ ও অনুকরণের মধ্যেই প্রগতি ও উন্নতির স্বপ্ন দেখছে। আর নিজেদের ধর্মকে 'সেকেলে' (!) মনে করছে। পিতা-মাতাকে সেই ধর্মের অনুকরণে অভ্যস্ত দেখলে তাদেরকে নির্বোধ, অগ্রগতিশীল ও প্রাচীনপন্থী ভাবছে এবং সেই ধর্মের উলামা ও দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গকে গোঁড়া, মৌলবাদী ও বুদ্ধিহীন জ্ঞান করছে। এর মাধ্যমে কিন্তু প্রকারান্তরে তারা নিজেকেই নির্বোধ ও বেকুফ ঠাওরাচ্ছে!! উপরন্তু তারা পবিত্র কুরআন ও শরীয়ত নিয়ে উপহাস করছে। এমনকি তাদের অনেকে ইসলামের ঘোরতম শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামের প্রথম কাতারের শত্রুদের দলভুক্ত হচ্ছে এবং চির ধ্বংস হচ্ছে! নাউযুবিল্লাহ!!

দ্বীনী ইলম বাদ দিয়ে শুধু পার্থিব শিক্ষা জায়েয নয়

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لا يخلف الله وعدة و لكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا
من الحيوة الدنيا وهم عن الأخرة هم غفلون

“আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা খেলাপ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা শুধু পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে অথচ তারা পরকালের খবর রাখে না।(সুরা রুম,৬-৭)

উক্ত আয়াতদ্বয়ের বার্তা হলো, পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করা বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং চরম নির্বুদ্ধিতা। যারা শুধু ইংরেজ ও দুনিয়াদারদের শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে কোনো ইলম রাখে না, দ্বীনী ইলমের কোনো পরোয়া করে না, উক্ত আয়াতে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনের কেবল একটা সাইড তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কীরূপে করবে, দালানকোঠা, বিল্ডিং-বাড়ি কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাসব্যসনের উপকরণ কিভাবে জোগাড় করবে— এ বিষয়ে তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর মূল ও প্রধান পিঠ তথা দ্বীন সম্পর্কে তাদের তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিতরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ এ পিঠেরই উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবনের আসল স্বরূপ ও লক্ষ্যকে স্পষ্ট করা, যা এক কথায় এভাবে প্রকাশ করা যায় যে,দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই
কিছুদিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ হবে। মানুষ প্রকৃতপক্ষে এখানের নয়, বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে এই যে, স্বদেশে (তথা আখেরাতে) সুখেশান্তিতে থাকার জন্য এখান থেকে সুখসামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। সেই সুখসামগ্রী থেকে
পবিত্র কুরআনে পৃথিবীর খ্যাতনামা বিত্তবান ও ভোগবিলাসী

জাতিসমূহের কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের কী অশুভ পরিণতি। হয়েছিল তা সবার সামনে বর্ণিত হয়েছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের জন্য রয়েছেই। এসব জাতিকে কেউই বুদ্ধিমান ও দার্শনিব বলতে পারে না।

কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল যে ব্যক্তি যতবেশি অর্থ জমা করতে পারে এবং ভোগবিলাসের যত উৎকৃষ্টতর সামগ্রী জোগাড় করতে সক্ষম হয়, তাকেই সর্বাধিক ‘বুদ্ধিমান’ মনে করা হয়। যদিও দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ! শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোকরে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়!

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ তাআলা, নবী-রাসূল, পরকাল এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আর দুনিয়ার উপায়-সামগ্রী প্রয়োজন পর্যন্ত সীমিত রাখে; এগুলোকে কখনো জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানায় না।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা দ্বীনী ইলম থেকে বঞ্চিত, যারা কোনো দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলম হাসিল করেনি বা খানকায় গিয়ে কিংবা দাওয়াতের লাইনে গিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে হক্কানী উলামা ও বুযুর্গগণের সাথে সম্পর্ক রেখে সহীহ ইলম অর্জন করেনি, তারা জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান নয়। তা তারা দুনিয়াদারদের পক্ষ থেকে যত বড় সনদপ্রাপ্তই হোক না কেন বা মূর্খ লোকেরা তাদেরকে যত মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীই মনে করুক না কেন।আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

أو من كان ميتا فأحيينه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله
في القلمت ليس بخارج منها

“একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনো বের হতে পারবে না?” (সুরা আনআম,আয়াত,১২২)

উল্লেখিত আয়াতে ঈমান-ইসলাম ও ইলম-আমলকে আলো বলা হয়েছে, আর কুফুর-শিরক ও মূর্খতা-বদদ্বীনীকে অন্ধকার বলা হয়েছে।

চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়; বরং বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তটির স্বরূপ ফুটে ওঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যাতে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচার এবং উপকারী বস্তুসমূহ অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমান ও দ্বীনী ইলমকে দেখুন, সেটি একটি নূর। যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এই আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ

ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ আলো থাকে, সে নিজেও ইহকাল ও পরকালের ক্ষতিকর সব বস্তু থেকে বাঁচতে পারে, এবং উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করতে পারে; অপরকেও বাঁচাতে পারে এবং পথপ্রদর্শন করে তাকেও সাহায্য করতে পারে।

পক্ষান্তরে যার কাছে ঈমান ও ইলমের আলো নেই, দুনিয়াবী দিক থেকে সে যত বড় ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, সে নিজেও অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইহকাল ও পরকালের উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে অজ্ঞ। ফলে সে নিজেও পারে না উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহ পার্থক্য করতে আর অপরকে তো পারেই না এ ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা করতে। সে সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক থেকে কোন বস্তু উপকারী আর কোন বস্তু অপকারী, তা নির্ণয় করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফির ও ইলমবিহীন ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভলোকসান কিছুটা চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোনো খবরই সে রাখে না। সে জীবনের লাভলোকসানের কোনো অনুভূতিই তার নেই ।

দেখুন, দ্বীনী জ্ঞানশূন্য একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এটা তো জানে যে, চোখটাকে কোন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে, এর মধ্যে কতগুলো অংশ আছে, এর মধ্যে কী কী রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার চিকিৎসা কী? কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই জানে না যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এ চক্ষু কেন দিয়েছেন? কিভাবে এ চক্ষুকে ব্যবহার করলে একজন মানুষ বেহেশতী হতে পারে এবং কিভাবে ব্যবহার করলে সে নির্ঘাত জাহান্নামী হয়— এ ব্যাপারে সে একেবারেই অজ্ঞ।

মোদ্দাকথা, ইলমহারা মানুষেরা পার্থিব বিষয়সমূহকে ধারণা ও অনুমান করে কিছুটা বুঝতে সক্ষম হলেও সঠিক আলোর অভাবে পরকালীন জীবনের কোনো খবরই রাখে না। সেখানের লাভলোকসানের কোনো অনুভূতিই তাদের নেই।

উল্লেখিত আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, ঈমান ও কুরআনের আলো শুধু মসজিদ-মাদরাসা, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আল্লাহ তাআলা যাকে এ আলো দান করেছেন, সে তা নিয়ে মানুষের মাঝে সর্বত্র চলাফেরা করে এবং সর্বত্র তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হয়; অপরকেও উপকৃত করে।

আলো কখনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। যেমনটি আমরা দেখি যে, একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধকারের সামনে নতি স্বীকার করে না। হ্যাঁ, তার আলো হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায় না ঠিক, কিন্তু নিভু নিভু হয়ে জ্বলতে থাকে। আলো যখন প্রখর হয়, তখন দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর যখন কম হয়, তখন আশপাশের অল্প স্থানই আলোকিত করে কিন্তু সর্বাবস্থায়ই অন্ধকারের ওপর সে বিজয়ী থাকে।

কখনো অন্ধকার তার ওপর জয়ী হতে পারে না। সে আলো আলোই নয়, যা আঁধারির কাছে পরাভূত হয়ে যায়। তদ্রূপ সে ঈমান ঈমানই নয়, যা কুফরের সামনে নতি স্বীকার করে কিংবা ভীত হয়ে যায়।

ঈমান ও ইলমের এই আলো মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমান ও ইলমের আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীবজন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না-কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলো বহনকারী মানুষ চাইল না যে, অন্য কেউ তা দ্বারা উপকৃত হোক। এবং অপর ব্যক্তিও এ ইচ্ছায় বের হলো না যে, তার আলো থেকে আমার উপকার হবে, কিন্তু যখন কারও সাথে আলো থাকে তখন চাক না-চাক, প্রাকৃতিকভাবেই সে আলো দ্বারা সকলেই উপকৃত হবে। ঠিক তেমনি মুমিনের ঈমান ও ইলমওয়ালার ইলম দ্বারা অন্যরাও কিছু না-কিছু উপকার লাভ করে। সে অনুভব করুক বা না করুক।

পক্ষান্তরে ইলমবিহীন কাফির নিজেও যথাযথ উপকৃত হতে পারে না, আর তার দ্বারা অন্যদের প্রকৃত উপকার ও কল্যাণের তো কোনো সম্ভাবনাই নেই।

বর্ণিত আয়াতের সারকথা হলো, মানব জীবনের লক্ষ্য হলো, সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে, সবকিছুর ফল ও পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সর্ববিচারে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু ক্ষতিকর। অতঃপর সেই চিন্তা থেকে স্বয়ং নিজের জন্যও উপকারী বিষয়াদি গ্রহণ করা এবং ক্ষতিকর জিনিসসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অন্যকেও সে সকল উপকারী বিষয়াদির প্রতি আহ্বান করা এবং মন্দ বস্তুসমূহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। যাতে চিরস্থায়ী সুখ, শান্তি ও আরামের জীবন অর্জিত হয়।

যখন মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবজীবনের পূর্ণতা বিধানের এই মৌলিক উপকার নিজেকেও অর্জন করতে হবে এবং অপরকেও পৌঁছাতে হবে, তখন কুরআনুল কারীমের এ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বাস্তব হয়ে সামনে এসে যায় যে, জীবিত কেবল সে ব্যক্তিই, যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করে। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি মৃত, যে ঈমান-ইসলাম, ইলম-আমল থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং দুনিয়াকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে তার জন্য নিজের মূল্যবান জীবনকে মাটি করেছে।

মনে রাখবেন, নিছক মানবিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও সায়েন্সের রিসাচ-গবেষণা করার দ্বারা কোনো মানুষ 'জীবিত'-এর সনদ পেতে পারে না। সে বরং মৃতই। কেননা তার কাছে সৃষ্টিকর্তার পরিচয়, নিজের পরিচয়, জীবনের লক্ষ্য ও পরিণাম এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সঠিক ইলম না থাকায় বাহ্যত সে জীবিত হলেও কুরআনের পরিভাষায় সে মৃত। সে না

নিজের উপকার করতে পারে, না অন্যের উপকার।
বর্ণিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ও কাফিরের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তিক্ত হলেও সত্য যে, বর্তমান দ্বীনবিমুখ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অবস্থা আয়াতে বর্ণিত কাফেরদের অবস্থার অনুরূপ! কুরআনের ইলমের আলো না থাকায় তারা জায়েয-নাজায়েয, ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে অক্ষম। বিধায় নিজের ও অন্যের সঠিক কল্যাণসাধনেও অক্ষম। আগে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিন; তারপর দুনিয়াবী শিক্ষা:
সন্তানকে ফরযে আইন পরিমাণ দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার পর যদি দুনিয়া উপার্জনের জন্য পার্থিব বিদ্যা শিক্ষা দেয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়। বরং সম্পূর্ণ জায়েয। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে ফরযে আইন ইলম থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখে সন্তানকে দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পরিণতিতে পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক সন্তান বেদ্বীন-নাস্তিকও হয়ে যাচ্ছে!
উপরন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এ সন্তানগুলোর অজ্ঞতা মুসলিম মিল্লাতের বিপর্যয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!! আল্লাহ ও রাসূল যেসব বস্তুকে মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সহীহ ইলম না থাকায় সেগুলোকেই তারা প্রগতির নেশায় ও আশায় একের পর এক গ্রহণ করে চলছে! ফলে নেমে আসছে ধ্বংস-বিপর্যয় ।
ইংরেজ তথা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের অনুকরণকে হাদীস শরীফে ধ্বংসের এক নম্বর কারণ বলা হয়েছে। অথচ দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম না থাকায় জেনারেল শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই পরোক্ষভাবে ইংরেজ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ইংরেজদের চিন্তাচেতনা, নিয়মনীতি, বেশভূষাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করছে এবং তাদের তোষামোদ ও অনুকরণের মধ্যেই প্রগতি ও উন্নতির স্বপ্ন দেখছে। আর নিজেদের ধর্মকে 'সেকেলে' (!) মনে করছে। পিতা-মাতাকে সেই ধর্মের অনুকরণে অভ্যস্ত দেখলে তাদেরকে নির্বোধ, অগ্রগতিশীল ও প্রাচীনপন্থী ভাবছে এবং সেই ধর্মের উলামা ও দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গকে গোঁড়া, মৌলবাদী ও বুদ্ধিহীন জ্ঞান করছে। এর মাধ্যমে কিন্তু প্রকারান্তরে তারা নিজেকেই নির্বোধ ও বেকুফ ঠাওরাচ্ছে!! উপরন্তু তারা পবিত্র কুরআন ও শরীয়ত নিয়ে উপহাস করছে। এমনকি তাদের অনেকে ইসলামের ঘোরতম শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামের প্রথম কাতারের শত্রুদের দলভুক্ত হচ্ছে এবং চির ধ্বংস হচ্ছে! নাউযুবিল্লাহ!!
দ্বীনী ইলম বাদ দিয়ে শুধু পার্থিব শিক্ষা জায়েয নয়
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-
لا يخلف الله وعدة و لكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا
من الحيوة الدنيا وهم عن الأخرة هم غفلون
“আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা খেলাপ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তারা শুধু পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে অথচ তারা পরকালের খবর রাখে না।(সুরা রুম,৬-৭)

উক্ত আয়াতদ্বয়ের বার্তা হলো, পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করা বুদ্ধিমত্তা নয়, বরং চরম নির্বুদ্ধিতা। যারা শুধু ইংরেজ ও দুনিয়াদারদের শিক্ষায় শিক্ষিত, যারা দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে কোনো ইলম রাখে না, দ্বীনী ইলমের কোনো পরোয়া করে না, উক্ত আয়াতে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, পার্থিব জীবনের কেবল একটা সাইড তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কীরূপে করবে, দালানকোঠা, বিল্ডিং-বাড়ি কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাসব্যসনের উপকরণ কিভাবে জোগাড় করবে— এ বিষয়ে তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর মূল ও প্রধান পিঠ তথা দ্বীন সম্পর্কে তাদের তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিতরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ এ পিঠেরই উদ্দেশ্য হলো, পার্থিব জীবনের আসল স্বরূপ ও লক্ষ্যকে স্পষ্ট করা, যা এক কথায় এভাবে প্রকাশ করা যায় যে,দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই কিছুদিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ হবে। মানুষ প্রকৃতপক্ষে এখানের নয়, বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে এই যে, স্বদেশে (তথা আখেরাতে) সুখেশান্তিতে থাকার জন্য এখান থেকে সুখসামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। সেই সুখসামগ্রী থেকে পবিত্র কুরআনে পৃথিবীর খ্যাতনামা বিত্তবান ও ভোগবিলাসী জাতিসমূহের কাহিনী উদ্‌ধৃত হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের কী অশুভ পরিণতি। হয়েছিল তা সবার সামনে বর্ণিত হয়েছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের জন্য রয়েছেই। এসব জাতিকে কেউই বুদ্ধিমান ও দার্শনিব বলতে পারে না।

কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয় হলো, আজকাল যে ব্যক্তি যতবেশি অর্থ জমা করতে পারে এবং ভোগবিলাসের যত উৎকৃষ্টতর সামগ্রী জোগাড় করতে সক্ষম হয়, তাকেই সর্বাধিক ‘বুদ্ধিমান’ মনে করা হয়। যদিও দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ! শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোকরে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়!

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ তাআলা, নবী-রাসূল, পরকাল এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আর দুনিয়ার উপায়-সামগ্রী প্রয়োজন পর্যন্ত সীমিত রাখে; এগুলোকে কখনো জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানায় না।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা দ্বীনী ইলম থেকে বঞ্চিত, যারা কোনো দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলম হাসিল করেনি বা খানকায় গিয়ে কিংবা দাওয়াতের লাইনে গিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে হক্কানী উলামা ও বুযুর্গগণের সাথে সম্পর্ক রেখে সহীহ ইলম অর্জন করেনি, তারা জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান নয়। তা তারা দুনিয়াদারদের পক্ষ থেকে যত বড় সনদপ্রাপ্তই হোক না কেন বা মূর্খ লোকেরা তাদেরকে যত মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীই মনে করুক না কেন।আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

أو من كان ميتا فأحيينه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله
في القلمت ليس بخارج منها
“একটু বল তো, যে ব্যক্তি ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে অন্ধকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা থেকে সে কখনো বের হতে পারবে না?” (সুরা আনআম,আয়াত,১২২)

উল্লেখিত আয়াতে ঈমান-ইসলাম ও ইলম-আমলকে আলো বলা হয়েছে, আর কুফুর-শিরক ও মূর্খতা-বদদ্বীনীকে অন্ধকার বলা হয়েছে।

চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়; বরং বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তটির স্বরূপ ফুটে ওঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যাতে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচার এবং উপকারী বস্তুসমূহ অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমান ও দ্বীনী ইলমকে দেখুন, সেটি একটি নূর। যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এই আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ আলো থাকে, সে নিজেও ইহকাল ও পরকালের ক্ষতিকর সব বস্তু থেকে বাঁচতে পারে, এবং উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করতে পারে; অপরকেও বাঁচাতে পারে এবং পথপ্রদর্শন করে তাকেও সাহায্য করতে পারে।

পক্ষান্তরে যার কাছে ঈমান ও ইলমের আলো নেই, দুনিয়াবী দিক থেকে সে যত বড় ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, সে নিজেও অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইহকাল ও পরকালের উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে অজ্ঞ। ফলে সে নিজেও পারে না উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহ পার্থক্য করতে আর অপরকে তো পারেই না এ ব্যাপারে কোনোরূপ সহযোগিতা করতে। সে সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক থেকে কোন বস্তু উপকারী আর কোন বস্তু অপকারী, তা নির্ণয় করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফির ও ইলমবিহীন ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভলোকসান কিছুটা চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোনো খবরই সে রাখে না। সে জীবনের লাভলোকসানের কোনো অনুভূতিই তার নেই।

দেখুন, দ্বীনী জ্ঞানশূন্য একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এটা তো জানে যে, চোখটাকে কোন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে, এর মধ্যে কতগুলো অংশ আছে, এর মধ্যে কী কী রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার চিকিৎসা কী? কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই জানে না যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে এ চক্ষু কেন দিয়েছেন? কিভাবে এ চক্ষুকে ব্যবহার করলে একজন মানুষ বেহেশতী

হতে পারে এবং কিভাবে ব্যবহার করলে সে নির্ঘাত জাহান্নামী হয়— এ ব্যাপারে সে একেবারেই অজ্ঞ।

মোদ্দাকথা, ইলমহারা মানুষেরা পার্থিব বিষয়সমূহকে ধারণা ও অনুমান করে কিছুটা বুঝতে সক্ষম হলেও সঠিক আলোর অভাবে পরকালীন জীবনের কোনো খবরই রাখে না। সেখানের লাভলোকসানের কোনো অনুভূতিই তাদের নেই।

উল্লেখিত আয়াতে এও বলা হয়েছে যে, ঈমান ও কুরআনের আলো শুধু মসজিদ-মাদরাসা, খানকা, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আল্লাহ তাআলা যাকে এ আলো দান করেছেন, সে তা নিয়ে মানুষের মাঝে সর্বত্র চলাফেরা করে এবং সর্বত্র তা দ্বারা নিজেও উপকৃত হয়; অপরকেও উপকৃত করে।

আলো কখনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। যেমনটি আমরা দেখি যে, একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধকারের সামনে নতি স্বীকার করে না। হ্যাঁ, তার আলো হয়তো অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছায় না ঠিক, কিন্তু নিভু নিভু হয়ে জ্বলতে থাকে। আলো যখন প্রখর হয়, তখন দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর যখন কম হয়, তখন আশপাশের অল্প স্থানই আলোকিত করে কিন্তু সর্বাবস্থায়ই অন্ধকারের ওপর সে বিজয়ী থাকে। কখনো অন্ধকার তার ওপর জয়ী হতে পারে না। সে আলো আলোই নয়, যা আঁধারির কাছে পরাভূত হয়ে যায়। তদ্রূপ সে ঈমান ঈমানই নয়, যা কুফরের সামনে নতি স্বীকার করে কিংবা ভীত হয়ে যায়।

ঈমান ও ইলমের এই আলো মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমান ও ইলমের আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীবজন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না-কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলো বহনকারী মানুষ চাইল না যে, অন্য কেউ তা দ্বারা উপকৃত হোক। এবং অপর ব্যক্তিও এ ইচ্ছায় বের হলো না যে, তার আলো থেকে আমার উপকার হবে, কিন্তু যখন কারও সাথে আলো থাকে তখন চাক না-চাক, প্রাকৃতিকভাবেই সে আলো দ্বারা সকলেই উপকৃত হবে। ঠিক তেমনি মুমিনের ঈমান ও ইলমওয়ালার ইলম দ্বারা অন্যরাও কিছু না-কিছু উপকার লাভ করে। সে অনুভব করুক বা না করুক।

পক্ষান্তরে ইলমবিহীন কাফির নিজেও যথাযথ উপকৃত হতে পারে না, আর তার দ্বারা অন্যদের প্রকৃত উপকার ও কল্যাণের তো কোনো সম্ভাবনাই নেই।

বর্ণিত আয়াতের সারকথা হলো, মানব জীবনের লক্ষ্য হলো, সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে, সবকিছুর ফল ও পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সর্ববিচারে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু ক্ষতিকর। অতঃপর সেই চিন্তা থেকে স্বয়ং নিজের জন্যও উপকারী

বিষয়াদি গ্রহণ করা এবং ক্ষতিকর জিনিসসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অন্যকেও সে সকল উপকারী বিষয়াদির প্রতি আহ্বান করা এবং মন্দ বস্তুসমূহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। যাতে চিরস্থায়ী সুখ, শান্তি ও আরামের জীবন অর্জিত হয়।

যখন মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবজীবনের পূর্ণতা বিধানের এই মৌলিক উপকার নিজেকেও অর্জন করতে হবে এবং অপরকেও পৌঁছাতে হবে, তখন কুরআনুল কারীমের এ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বাস্তব হয়ে সামনে এসে যায় যে, জীবিত কেবল সে ব্যক্তিই, যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করে। পক্ষান্তরে ওই ব্যক্তি মৃত, যে ঈমান-ইসলাম, ইলম–আমল থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং দুনিয়াকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে তার জন্য নিজের মূল্যবান জীবনকে মাটি করেছে।

মনে রাখবেন, নিছক মানবিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও সায়েন্সের রিসাচ–গবেষণা করার দ্বারা কোনো মানুষ ‘জীবিত’-এর সনদ পেতে পারে না। সে বরং মৃতই। কেননা তার কাছে সৃষ্টিকর্তার পরিচয়, নিজের পরিচয়, জীবনের লক্ষ্য ও পরিণাম এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সঠিক ইলম না থাকায় বাহ্যত সে জীবিত হলেও কুরআনের পরিভাষায় সে মৃত। সে না নিজের উপকার করতে পারে, না অন্যের উপকার।

বর্ণিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ও কাফিরের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তিক্ত হলেও সত্য যে, বর্তমান দ্বীনবিমুখ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অবস্থা আয়াতে বর্ণিত কাফেরদের অবস্থার অনুরূপ! কুরআনের ইলমের আলো না থাকায় তারা জায়েয-নাজায়েয, ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে অক্ষম। বিধায় নিজের ও অন্যের সঠিক কল্যাণসাধনেও অক্ষম।

পরিশেষে বলা চলে সন্তানকে কুরআন হাদীসের আলোকে প্রতিপালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সুন্নাত ব্যতিরেকে সন্তান প্রতিপালনের ষোলোআনাই বৃথা।

নামঃ রেজওয়ানা আহমেদ
রোলঃ১৯০২০৯৬
নাম্বারঃ০১৮৭৬২৬৭০৯৪
ঠিকানাঃ দাগনভূঞা,ফেনী।